Vol. 41 | No. 1 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী কাব্যের শিল্পরূপ

Volume	41
Issue	1
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অমৃতলাল বালা
Published online	October 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v41i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i1.4
Pages	73-89
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী কা

Check for updates

অমৃতলাল বালা*

মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী কবি দৌলত কাজী (আনুমানিক ১৬০০-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর একমাত্র কাব্য 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' অসমাপ্ত হলেও এ কাব্যে কবির একটি পরিণত শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র চিত্রণ, কাহিনী ধারার বর্ণনা, ঘটনার দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি, ভাষা রীতিতে সঙ্গীত তরঙ্গ সৃষ্টি, ছন্দের প্রয়োগসিদ্ধি এবং আলঙ্কারিক বর্ণনার নৈপুণ্যে দৌলত কাজীর পূর্ণাঙ্গ শিল্প-প্রতিভার পরিচয় আছে।

দৌলত কাজীর সংযম ও পরিমিতিবোধ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি ও বাণী বিন্যাসের অভিনবত্বে অপূর্ব শিল্পদক্ষতার প্রতিফলন এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন প্রকৃত কবি-শিল্পী। শব্দ ও ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ নৈপুণ্যে চিত্রকল্প, রূপকল্প প্রভৃতি প্রসাদগুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। কেবল আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়, হৃদয়ের উদ্দাম-উত্তাল আহাজারিও নয়, প্রকৃত শিল্প প্রতিভার সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তির সমন্বয় ঘটেছে এ কাব্যে। তাই রচনারীতির বিচারে বাণীভঙ্গিমায় ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারা সংমিশ্রণ লক্ষ্যযোগ্য। কবির সংযম ও পরিমিতিবোধ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি, বাণীবিন্যাস ও প্রয়োগকৌশল কাব্যটিকে অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা দান করেছে। বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত সমাজ এ কাব্যের শিল্প সার্থকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> "দৌলত কাজী শুধু বাঙালী মুলসমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ, তাঁহার শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধ তীক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী।"[১]

মিয়া সাধনের হিন্দিকাব্য 'মৈনাসত' অবলম্বন করে কাজী দৌলত তাঁর কাব্য রচনায় অগ্রসর হন, কিন্তু কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পর অকালে কবি মৃত্যুবরণ করেন। কাব্যের বাকি অংশ সমাপ্ত করেন রোসাঙ্গের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল।

---

* সহযোগী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

১. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য* (মনসুর মুসা সম্পাদিত মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৬০

কাজী দৌলতের এ কাব্য অসম্পূর্ণ ; কিন্তু শিল্প প্রতিভা পরিপূর্ণ। ওয়াকিল আহমদের উক্তিতে এ সত্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

> "কবির কাব্যবস্তু নির্বাচনে, কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্র-চিত্রণে এক সচেতন শিল্পপ্রয়াস ক্রিয়া করেছে। হিন্দীকাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে ঘটনার গ্রহণ বর্জন দ্বারা তিনি কাব্যকে নতুন ভাবরসে মণ্ডিত করেছেন। হিন্দী কাব্যের অধ্যাত্ম রূপককে মানবিক রসসাহিত্যে রূপান্তরিত করে তিনি নিছক শিল্পমূর্তি গড়েছেন। কাল্পনিক অংশ বাদ দিয়ে গল্পকে রোমান্সমুক্ত বাস্তব ভিত্তি দিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলি সজীব ও সক্রিয়।"[২]

ওয়াকিল আহমদের এ অভিমতে দৌলত-প্রতিভার যাথার্থ্য ধরা পড়েছে। আরও অনেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবির শিল্প-চৈতন্যকে দেখার চেষ্টা করেছেন। সুকুমার সেন বলেছেন, 'দৌলত কাজী বাঙ্গালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পুরানো বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম।"[৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সঠিকভাবে বলতে গেলে দৌলত কাজীই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ত্য-জীবনরসের কবি। উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি ও বিচক্ষণতা বিচার করলে দৌলত কাজীর কাব্যকে মধ্যযুগের একখানা মূল্যবান মর্ত্যজীবনের অসাম্প্রদায়িক কাব্য বলে গণ্য করতে হবে।"[৪] অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মনে করেন— "দৌলতের কাব্য সরস করিত্বে পূর্ণ। স্থানে স্থানে বর্ণনা যেমন কবিত্বময় তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তাঁর 'বারমাস্যা' প্রচলিত সাধারণ বর্ণনাগুলির মত প্রাণহীন বা গদ্যময় নয় ; বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নায়িকার বেদনাতুর চিত্তের যোগাযোগ সম্পন্ন হয়ে সুললিত সঙ্গীতে নিখিল মানবের অন্তর্নিহিত বেদনার আভাসও এর মধ্যে স্পষ্ট ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।"[৫] সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল 'বারমাস্যা' ছাড়াও দৌলত কাজীর ব্রজবুলিতে পদ রচনার কৃতিত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এ সূত্রে তিনি জয়দেব, কালিদাসের প্রভাবজাত বেশ কিছু পদের শিল্পমূল্য যাচাই করেছেন।[৬] ভাষা ও শব্দ

---

২. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, ঢাকা, ১৯৮৭, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ২৫৮

৩. সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৩৮০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৫

৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড : প্রথম পর্ব*, কলিকাতা, ১৯৮০ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৭১৩-১৪, ৭২৫

৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত, 'দৌলত কাজির সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী', *সাহিত্য প্রকাশিকা*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৩৬২, পৃ. ১৭

৬. From a Careful study of Daulat's work, we are inclined to belive that he had good acquanted not only with the vaishnava lyrics, but also with the Sanskrit poet Joydeva, the Hindu epic and the Puranas, and even with

প্রয়োগে দৌলত কাজীর সার্থকতা মুল্যায়ন করে মযহারুল ইসলাম ও দুলাল চৌধুরী বলেন,— 'শব্দার্থ সহিতম্ কাব্যম্' এই উক্তি দৌলত কাজীর কাব্যে সত্য হয়েছে। তিনি আরবি, ফারসি আরাকানি, বর্মি, সংস্কৃত প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারও এই সূত্রে যে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বহু বিচিত্র শব্দ ব্যবহার করে দৌলত কাজী বাংলা ভাষাকে বেশ প্রাণবন্ত করেছেন।[৭]

'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের নির্মাণ-শৈলী সম্পর্কে পণ্ডিতদের এসব মত যথার্থ। এবার আমরা নিজ বক্তব্যে তা পরীক্ষা করে দেখব।

এ কাব্যের চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে কাজী দৌলত অপরিসীম সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের রোমান্সকাব্যের ধারায় কবিরা গল্পের জন্যে নিছক গল্প রচনা করেছেন, চরিত্রচিত্রণের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখেন নি। কিন্তু কাজী দৌলত স্বতন্ত্র ধারার কবি, "তিনি গল্পের বাঁধনে মানবজীবন, মানবচরিত্র অঙ্কন করেছেন। একটি পুরুষচিত্তকে ঘিরে দু'টি নারীহৃদয়ের দেনা-পাওনার দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান নিয়ে কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। প্রেমই এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কেন্দ্র।"[৮] ত্রিভুজ প্রেমের এ কাহিনীতে নর-নারীর হৃদয়গত কামনা-বাসনার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। এ কাব্যের চরিত্রগুলো সবই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর, একমাত্র মালিনী চরিত্র ছাড়া। মালিনী চরিত্র সামন্ত সংস্পর্শে থেকে সাধারণ স্তর থেকে এসেও আসল রূপ হারিয়েছে। কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে তার ছলাকলা ও চাতুর্য। মালিনী এ কাব্যে একটি টাইপচরিত্র। অন্যসব চরিত্র সামন্ত সমাজ থেকে গৃহীত। কবির কাব্য-আদেষ্টা 'লস্কর উজির' আশরফ খান ও অমাত্যবর্গের সামন্ত-চেতনা ছিল প্রবল। সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। কেবল 'লোর-চন্দ্রানী' নয়, অন্য সব রোমান্টিক কাব্যেও সামন্ত সমাজের স্বভাব এবং অভিজ্ঞতা, প্রচলিত কলারীতি এবং পাঠকের রুচি অনুযায়ী চরিত্র ও কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। কবিদের স্বাধীন চিন্তার অনুকল্পে নতুন আদর্শের আবিষ্কার এবং অনুসরণ সম্ভব হয় নি।[৯]

Kalidas.

— Satyendra Nath Ghosal, Beginning of Secular Romance in Bengali Literature', *Visva Bharati Annals*, Vol. IX, June, 1959, Santiniketan, P. 35

৭. মযহারুল ইসলাম ও দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, *সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী*, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৩

৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩

৯. ঐ।

কাজী দৌলতের চরিত্র-চিত্রণের বিশেষত্ব হলো মানুষের জীবন সম্বন্ধে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা, মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদ ও মমত্ববোধ, সর্বোপরি কবি 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'—এ নীতিবাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন স্থাপন করে কবি তাঁর কাব্যের মানব-মানবীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এ কাব্যের লোর-ময়না-চন্দ্রানী প্রত্যেকেরই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বেশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। লোর সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। সে এ কাব্যের নায়ক। মধ্যযুগের একজন সামন্ত রাজার চরিত্রে যে দোষ-গুণ থাকা স্বাভাবিক তা লোরের চরিত্রে ছিল। লোর বিবাহিত। অন্ত:পুরে তার বিবাহিত সুন্দরী স্ত্রী ময়না আছে ; তা সত্ত্বেও লোর বনবিহারে গিয়ে ময়নাকে উপেক্ষা করে পরস্ত্রী চন্দ্রানীকে লাভ করার জন্যে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় ভদ্রলোক শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার, জায়গিরদার ও আমিরগণ প্রেম যে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্যকিছু নয়, এ বিষয়ে একেবারে নির্মোহ ছিলেন। রাজা লোরও এ শ্রেণীভুক্ত। তবু ভাবলে অবাক হতে হয় মধ্যযুগীয় এই সামন্তশ্রেণী মানব-মানবীর প্রেমসম্পর্ককে একটা মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রিরংসা নয়, শরীরের মধ্যে আবদ্ধ অকল্পনীয় দুর্লভ ইচ্ছাসমূহের অপূর্ব মুক্তি সাধনের পথকে বাৎলে দিয়েছেন তাঁরা। প্রেমের এমন নিরঙ্কুশ চর্চা, কাব্যে তার এমন অভাবনীয় রূপ,—তার কথা এই প্রথম জানতে পারে মানুষ। নারী যে সংসারের আর দশটা আসবাবপত্রের মতো নয়, তাকেও যে জয় করতে হয়, বৃহৎ বিশ্বে তারও যে স্বতন্ত্র আসন রয়েছে, তারও স্বীকৃতি পাওয়া গেল রোমান্স কাব্যে। তা সত্ত্বেও দৌলত কাজীর কাব্য পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার মধ্যে আছে ব্যভিচারিতা। লোর কর্তৃক চন্দ্রানী অপহরণ একটি সত্য ঘটনা। কিন্তু চন্দ্রানীর দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় বাৎসায়নের কথাই ঠিক, অর্থাৎ সন্তানহীনা নারী সন্তান কামনায় দ্বিতীয় প্রেমিক সংগ্রহ করতে পারে।[১০] সে কারণে নপুংসক বামনের কাছে তার আশা করার কিছু ছিল না।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের রোমাঞ্চকর প্রেম যতই স্বপ্ন-রঙীন হোক—প্রেমের প্রতি যতই সে শ্রদ্ধা নিবেদন করুক—ব্যক্তি-হৃদয়ের যত মূল্যই সে দিক, সে সাহিত্য মূলত শ্রেণী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—শোষণকারীদের সাহিত্য। নারীকে সে যেমন বড় করেছে, তেমনি আবার ছোটও করেছে। বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে সে অস্বীকার করেছে—নার-নারীর বিবাহ-পূর্ব মিলনকে উৎসাহিত করেছে—পরকীয়াকে মহৎ করেছে। আর এটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে ধর্মের নামকে কলুষিত করেছে।

---

১০. আবদুল হাফিজ, *বাংলা রোমান্স কাব্য পরিচয়*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৪৫, ৬৮

সুফিদের মরমিয়া সাধনাকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কাজে ব্যবহার করেছে।[১১] বিবাহ সম্পর্ককে কিভাবে লোর পদদলিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় সামন্তদের প্রেমের বেদিতে আত্মদানকারিণী ময়নাবতীর উপেক্ষিত জীবনে। সামন্ত-নায়কের প্রেমের বেদিতে শুধু ময়নাবতী নয়, আলাওলের নাগমতিও আত্মদান করেছে। প্রচুর ভোগ আর অবসর-বিনোদনে অভ্যস্ত সামন্ত-নৃপতি উদ্দাম-জীবনে উত্তেজনাকর পরিবেশে পরকীয়া প্রেমতত্ত্বে আকৃষ্ট হতেন বেশি। দৌলত কাজী অমাত্যসভার এ দাবি পূরণ করার মানসে রাজা লোরকে পরকীয়া প্রেমের নায়করূপে চিত্রিত করেছেন।

দৌলত কাজী বাস্তবধর্মী চরিত্র অঙ্কনে অভ্যস্ত। রাজা লোর এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বাস্তবধর্মী নায়কচরিত্রের লক্ষণসমূহ এ চরিত্রে বিকশিত হয়েছে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে রোমান্সরস পরিবেশনের স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও দৌলত কাজী তাঁর কাব্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে অলৌকিক অস্বাভাবিক অতিরঞ্জিত কল্প-কাহিনীর রাজ্যে তাদের নিয়ে যাননি, বরং স্বাভাবিক রক্ত-মাংসের মানব-মানবীরূপে গড়ে তুলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ মর্ত্যপ্রেমের কাব্য রচনা করা। সে কারণে তাঁর কাব্যের নর-নারী মানবিক অনুভূতিশীল জীবন্ত মানুষ। নায়কচরিত্র হিসেবে লোর ত্রুটিমুক্ত নয়, দোষ-গুণ উভয়ই তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। "প্রেমের জন্য মজনুর ত্যাগের, ফরহাদের ত্যাগের যে আদর্শ আছে, লোর তা ধারণ করে না। লোরের মধ্যে 'ডুইং' আছে, 'সাফারিং' নেই। এজন্য সে নায়ক হলেও বড় চরিত্র নয়। সে মধ্যযুগের সামন্তদের একজন সজীব প্রতিনিধি মাত্র। ময়নাও সজীব চরিত্র কিন্তু সক্রিয় নয়। তার মধ্যে 'সাফারিং' আছে, 'ডুইং' নেই। তবে ময়নার তুলনায় চন্দ্রানী অনেক সক্রিয় চরিত্র। সক্রিয় এজন্য যে তার মধ্যে 'ডুইং' ও 'সাফারিং' দু-ই আছে। চন্দ্রানীকে খণ্ড চরিত্র হিসাবে পাই না, পূর্ণ চরিত্র হিসাবে পাই। এজন্য কাব্যের অধিক অংশ জুড়ে চন্দ্রানীর প্রেম-বিরহ-মিলনের কথা স্থান পেয়েছে।"[১২]

ময়নাবতী ও চন্দ্রানী উভয়ই এ কাব্যের নায়িকা চরিত্র। তবে প্রধান নায়িকা হিসেবে পাওয়া যায় চন্দ্রানীকে। কাব্যের গুরুত্ব বিবেচনায় ময়নাবতীকে নায়িকা হিসেবে গণ্য করতে হয়। লস্কর উজির আশরফ খান কবির কাছে শুনতে চেয়েছিলেন 'ময়নার ভারতী'। কবি এ খবর দিয়েছেন :

---

১১. ঐ, পৃ. ৮২-৮৩

১২ ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৪-'৫৬

শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।।.....
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন্ মতে হৈল ময়না প্রতিব্রতা সতী।।

আদিষ্ট হয়ে কবি—

তবে কাজি দৌলত বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।।

স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি ময়নাকে প্রধান নায়িকারূপে তারই 'ভারতী' রচনায় অগ্রসর হয়েছেন ; এবং কাব্য-কাহিনীর গুরুত্ব ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাকেই কবি বিজয়িনী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও চন্দ্রানীই এ কাব্যের প্রধান নায়িকা। ময়নার তুলনায় চন্দ্রানী অধিকতর সক্রিয় জীবনভোগে চন্দ্রানী প্রেমের সার্থকতা খুঁজেছে, সামন্ত-সমাজের উপযোগী ভোগবাদী চরিত্র চন্দ্রানী। নীতিধর্ম ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে জীবন-ভোগবাসনায় সে তৎপর হয়েছে। চন্দ্রানীর সক্রিয় ভূমিকার কাছে ময়নার স্বল্প নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অনেকাংশে উপেক্ষিতা ও ম্লান হয়ে পড়েছে। তার চরিত্রে আদর্শবাদের মূল শক্তি তার একনিষ্ঠ পতিপ্রেম। তার ভূমিকা বাস্তব ও অকৃত্রিম হওয়া সত্ত্বেও আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও সংগ্রামের স্পৃহা নেই। অন্যদিকে নপুংসক স্বামীর স্ত্রী হয়ে ভাগ্যের এ বিড়ম্বনা চন্দ্রানী মেনে নেয়নি। সে আপন অধিকার আদায় করে নিয়েছে জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য। "চন্দ্রানী আদর্শকে দলিত করেছে, কিন্তু জীবনকে পূর্ণভাবে পেয়েছে। ময়না আদর্শের জন্য জীবনকে বলি দিয়েছে, চন্দ্রানী জীবনের জন্য আদর্শকে বলি দিয়েছে। মানববৃত্তির দিক দিয়ে চন্দ্রানীর ভোগবাদ অযথার্থ নয়, কেবল ভোগবাসনাবৃত্তির নগ্নপথ কলঙ্ককজনক হয়েছে। এজন্য চন্দ্রানী প্রেমবিজয়িনী হয়েও কলঙ্কিনী। তার প্রেমসাধনায় প্রাণ আছে কিন্তু রুচি নেই, বাস্তবতা আছে কিন্তু শালীনতা নেই। ময়না ও চন্দ্রানী বিপরীতমুখী দুই প্রান্তে থেকে প্রেমের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ময়না আদর্শবাদী এবং চন্দ্রানী ভোগবাদী প্রেমের প্রতিনিধি।"[১৩] নায়ক-নায়িকার প্রেমোচ্ছল যৌবনদীপ্ত ও সম্ভোগক্রিয়ার কাব্যিক বর্ণনা এ কাব্যের মানবিক রসকে ঘনীভূত করে। কবি লিখেছেন।

---

১৩ ঐ, পৃ. ২৫৫-'৫৬

প্রথমে মদন কোল ঘন আলিঙ্গন।
কামযুদ্ধে ভয় লজ্জা ধর্ম পলায়ন।।
দন্তে দন্তে ঘরষণ বদনে বদন।
পুলকে পুরয় তুন সঘন চুম্বন।।
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতিযুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।।

এ চিত্র আমাদের রুচিকে পীড়িত করে ; কিন্তু মানবিক রস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যের কবিরা মানব-রসের কাব্য রচনা করতে গিয়ে 'রতিক্রিয়া' ও 'কামচর্চা'কে অস্বীকার করতেন না। "কবিগণ অত্যন্ত ভালভাবে জানতেন যে, সব রকমের প্রেমের মূলে আছে দেহজ কামনা যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিলেও অগ্রাহ্য করা যায় না। কামকে অগ্রাহ্য করা হয় নি বলেই কাব্যগুলিতে মানবীয় আবেদন অত্যন্ত বেশী।"[১৪] কাজী দৌলত নায়ক-নায়িকার সম্ভোগচিত্রে মানবীয় আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু যে সম্ভোগ-স্পৃহায় কেবল কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থতার মোহ থাকে, সাধনার শক্তি কিংবা ত্যাগ-তিতিক্ষার নিদর্শন থাকে না, তা যত শক্তিশালী হোক, তা জয়যুক্ত হতে পারে না। এ কাব্যে ছাতনের ভূমিকাও তাই। ছাতন নিছক কামুক চরিত্র। ভিলেন চরিত্র হিসেবে এ কাহিনীতে তার গুরুত্ব আছে। ময়নার অন্তরে প্রণয়াসক্তি জাগাবার জন্যে সে রত্নামালিনীকে দূতিয়ালি করতে পাঠিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ছাতনের হৃদয়ে সাধনাগত প্রেম ছিল না, ছিল কামনার হলাহল, তাই ময়নাকে পায়নি ; ময়নাকে কবি পাইয়ে দিলেন লোরকে। লোর এ কাব্যে প্রেমের নামে যতই লালসাবৃত্তি ও ভোগবাসনায় অনুরক্ত হোক, যতই বিবাহিতা স্ত্রীকে উপেক্ষা করে সামাজিকতার দিক থেকে অন্যায় কাজ করুক, এবং অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে অপহরণের মাধ্যমে গুরুতর অপরাধ করুক, তবুও শেষ পর্যন্ত পতিবিরহক্লিষ্ঠা সতী-সাধ্বী স্ত্রী ময়নাবতীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের আকর্ষণে সে ছুটে এসেছে। কারণ ময়নাবতীর স্থির বিশ্বাস—পতি সর্বস্ব, পতির পায়ের তলায় সতীর স্বর্গ। সাধনা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জোরেই ময়না তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। ময়নার শুচি-শুভ্র-পবিত্র প্রেমের যথার্থ মূল্য দেওয়ার প্রেমিক-হৃদয় ছিল লোরের মত সামন্ত নৃপতির। 'পদ্মাবতী' কাব্যে রত্নসেনও ফিরে এসেছিল স্বরাজ্যে বিবাহিতা স্ত্রী নাগমতির কাছে। নাগমতি ও ময়নাবতীর প্রেমসাধনায় এই ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা যায়। ছাতনের মতো আলাউদ্দীন ও

১৪. মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১, পৃ. ২৯৮

দেবপাল কামনার হলাহল ঢেলে যথাক্রমে নাগমতি ও পদ্মাবতীকে লাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত। তাদের প্রেমে সাধনার শক্তি ছিল না। সতীময়নার চরিত্রাঙ্কনে কবি ভারতীয় সতীনারীর আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। এই ধূলি-মলিন, পাপ-তাপের সংসারে সীতা-সাবিত্রী-বেহুলা যেভাবে তাঁদের সতীত্ব রক্ষায় প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে বিজয়িনী হয়েছে, দৌলত কাজীর ময়নাবতীও তাদের সমগোত্রীয়া। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসীম ধৈর্যের দ্বারা অভীষ্ট লাভ করতে সে সক্ষম হয়েছে। ময়না চরিত্রের আদর্শবাদ কবি ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
অন্য পুরুষ নহে লোর সমতুল।।
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথা এ গোমএ কীট কোথা এ মধুপ।।
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন একাল ভুজঙ্গ।।

এক আদর্শ নারীমূর্তির উজ্জ্বল প্রতীক সতীময়না। তার পাশাপাশি চন্দ্রানীর উচ্ছল নাকিয়ামূর্তির জীবনচাঞ্চল্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে প্রবলভাবে। আর লোরের চরিত্র অঙ্কনের কবি আদর্শ পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা একটি বাস্তবধর্মী নায়ক চরিত্রের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী'র কাহিনী-অংশে রূপকথার রোমান্সের প্রভাব আছে। তবুও কাহিনীকে বাস্তবসম্মত ও মানবিক করে তোলার জন্যে কাজী দৌলত অলৌকিক-অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃতের প্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গেছেন। রূপকথার রাজ্যের লোক-ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন ও নতুন অর্থান্বিতকরণের লক্ষণ এ কাব্যে দেখা যায়। রোমান্সকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—প্রেম, যুদ্ধ, অভিযাত্রা ও মরমিবাদের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়েছে। কাজী দৌলত এ কাব্যের কাহিনী অংশ ও আখ্যানভাগ মূলত মৌলানা দাউদের 'চন্দাইন' এবং ময়নার বারমাসী অংশটি মিয়া সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন।[১৫] লোক-ঐতিহ্যের উপাদান এবং রোমান্সকাব্যের চারিত্র্যলক্ষণ অবলম্বন করে কাজী দৌলত কাব্যকাহিনী বিবৃত করলেও গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে নিজ বুদ্ধিবৃত্তি, সংযমবোধ ও মার্জিত

১৫. মযহারুল ইসলাম ও দুলাল চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

রুচির প্রভাবে কাব্যটিকে একটি বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। কবির বাস্তবতাবোধই কাব্যটিকে নতুন মহিমা দান করেছে। তিনি ভাষারীতি, উপমা প্রয়োগের দিক থেকে সংস্কৃতানুসারী প্রাচীন কাব্যধারার অনুবর্তন করলেও ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়-কাহিনী প্রবর্তনে নতুন বিষয়বস্তু ও আখ্যানভঙ্গির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। দৈবপ্রভাবহীন স্বাধীন আবেদনে সাড়া দিয়ে কবি জীবনের একটা উপেক্ষিত অধ্যায়কে প্রকাশ করেছেন এবং উপন্যাসের বস্তুরসপ্রধান অংশের সঙ্গে রোমান্সপ্রবণতার একটি বাস্তব ভিত্তি যুগিয়েছেন।[১৬] অতি-উচ্চ মানবতাবোধ এবং বস্তুরসপ্রিয়তা মধ্যযুগের সর্বাত্মক ধর্মীয় প্রভাবের মধ্যেও কবিকে বাস্তববাদী করে তুলেছিল বেশি। পুরুষসামন্ত কর্তৃক নারীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অবহেলা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় পুরুষজাতির চরিত্র তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন এভাবে :

যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।।

এই 'পুরুষ জাতি'—

আচম্বিত মতি হৈল লোরক-নৃপতি।
ছাড়িয়া রতন হার গুঞ্জাত আরতি।।
প্রাণসম মহিষী করিয়া একসরী
কানন বিহার ইচ্ছে লোরক কেশরী।।

'পুরুষ জাতি' কর্তৃক নারীজীবনের প্রতি এ ধরনের অবহেলা-লাঞ্ছনা কবি মেনে নিতে পারেননি। আর সে সঙ্গে পুরুষের পরকীয়া প্রেমের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে কবি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কষাঘাত হেনেছেন। এ কারণে রোমান্স-কাহিনীকারদের মধ্যে দৌলত কাজী বেশি Realist বা বাস্তববাদী। বাস্তববাদী কবিই শুধু পারেন জীবনকে সাদা চোখে দেখতে। মানবতাবাদী এ চেতনার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য কবি মধ্যযুগকে পেছনে ফেলে আসতে চেয়েছিলেন, রচনা করতে চেয়েছিলেন মানবিক প্রেমমূলক সফলতা-বিফলতার কাহিনী। তা সম্ভব হলেও মধ্যযুগ তাঁকে ছাড়েনি। সে কারণে মধ্যযুগের সামন্ত দরবারের নিয়ম-নীতি ও মধ্যযুগীয় রীতি-আদর্শ তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা সম্ভব হয়নি। তা সম্ভব হলে কাজী দৌলত কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন।

---

১৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলিকাতা, (১৯৭২ (পঞ্চম সংস্করণ), পৃ. ১৬-১৭

মধ্যযুগের কাব্যরীতি অনুযায়ী কবিরা তাঁদের কাব্যে ১. আল্লাহ্ বন্দনা, ২. রসুল প্রশস্তি, ৩. রাজপ্রশস্তি, ৪. সভাসদ প্রশস্তি, ৫. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও ৬. কাহিনী-উপকাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতেন। কাহিনীতে প্রবেশের আগে কাজী দৌলত এসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা খুবই সংক্ষিপ্ত। অল্পকথায় কবি বিস্তর বুঝিয়েছেন। কাব্য-কাহিনীতে প্রবেশ করেও কবি 'অল্পে বিস্তর' নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। কোথাও পুনরুক্তি দোষ কিংবা আবেগ-উচ্ছ্বাসজনিত অতিকথন দোষ কবির সংযত ও পরিমিত বোধের অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি' পরিচ্ছেদে 'নর বন্দনা'য় কবি মাটির মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন। এবং মর্ত্যের জীবনরসে তা পূর্ণ করেছেন। নরবন্দনার এ অংশটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল-ব্যতিক্রম। কবি লিখেছেন :

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান।।

নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরমদেব তন্ত্রমন্ত্র জ্ঞান।।

নর সে পরমদেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।।

তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল।।

কবির দৃষ্টিতে 'নর অমূল্য রতন'। বৈষ্ণব সহজিয়া কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠেও আমরা শুনেছিলাম—'শুনহ মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এই মানবতাবাদ সে যুগে যখন মানুষ দেবতার হাতের পুতুল, মানুষ যখন সামন্ত রাজার নির্মম শাসনে শঙ্কিত ও পীড়িত, তখন সামন্ত রাজসভায় বসে নিছক 'নরবন্দনা' দৌলত কাজীর সুললিত দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। কবির 'মৃত্তিকাস্তুতি'ও জীবনরসে পূর্ণ। কবি বলেছেন :

সিদ্ধি পদ পুন্য পদ পৃথিবীতে সব।
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব।।
মাটি হস্তে রত্নমণি রূপের প্রতিমা।
সৃজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা।।

পরম হংসের খেলা মাটির পাঞ্জর।
মাটি ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর।।
মাটি হন্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল।
ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল।।
নানা রঙ্গে কেলি কলা উপজে বিলাস।
মৃত্তিকায় ভোগ পুনি মৃত্তিকা গরাস।।

কবির এ মৃত্তিকাস্তুতি যদিও আধুনিক কোন মানবতাবাদী জীবনরস বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয় এবং সুফি মরমি সাধনাই এর প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য, তা সত্ত্বেও মধ্যযুগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, 'নরবন্দনা'র মতো 'মৃত্তিকাস্তুতি'তেও মাটির মানুষের জীবনরসের জয় ঘোষণা করেছেন। সুফি-দর্শনে 'নরতত্ত্বে' ও 'মৃত্তিকাতত্ত্বে'র স্বীকৃতি আছে। কবি এ 'হিন্দু-কাহিনী'কে যথাযথভাবে রূপায়ণ করলেন। কোথাও অনাবশ্যক ইসলামিভাবের আমদানি করেননি। হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার, জীবন, আদর্শ ও শাস্ত্রসংহিতালব্ধ নানা তথ্য-উপাত্ত অবলম্বন করে তিনি যেভাবে কাব্যের রূপ দিয়েছেন, তাতে তাঁর কাছে একজন হিন্দু কবিও হার মানে। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওলেরও এ ক্ষমতার পরিচয় আছে, তিনি সুফি মতাবলম্বী কবি ছিলেন এবং উদার-অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কাহিনী রচনা করেন। সংস্কৃতি-সমন্বয়-সঙ্গতি সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল রোসাঙ্গ অমাত্য দরবারের। দৌলত কাজী এ ধারার অগ্রপথিক। চিত্রকল্প, উপমা, উদাহরণ প্রভৃতিতে কবি সর্বত্রই হিন্দু মনোভাব রক্ষা করেছেন তা অল্প-বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অজস্র উক্তি-প্রত্যুক্তিতে কবি হিন্দু-ঐতিহ্য অনুসরণে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলী, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারত, কবি জয়দেব, কালিদাসের কাব্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কাব্যের রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা নির্মাণে সেসব বিশেষ সহায়তা করেছে। তা সত্ত্বেও কবির নিজস্বতা ও মৌলিকতা আমাদের চোখে পড়ে। কয়েকটি পৌরাণিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ নিচে উদ্ধৃত হলো :

১. বিধবা শিউলী বৃদ্ধা বেচে রত্নহার।
ভীমসম বলীও না করে বলাৎকার।।
সীতাসম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।
রাজ-ভয়ে না নিরক্ষে সহস্র লোচনে।।

২. সত্য-বলে রাজা হৈল পাণ্ডব নন্দন।
সত্য সে পরম সিদ্ধি বিজয় কারণ।।

৩. তোমার কারণে লোর ধরে পীতাম্বর।
গৌরী প্রেম ভাবে যেন উন্মত্ত শঙ্কর।।

৪. শিব গৌরী কালী পদে মোর আরাধন।
ক্ষেপৌক বরশি পুনি লোরক রাজন।।

৫. অবশ্য শুনিয়াছি পাপী পুরাণে কথন।
প্রজাপতি বংশে জন্ম রাজা দশানন।।

৬. লোরের বুকেত মুই দেখিলু কুমারী।
কায়া দুই প্রাণী এক যেন হরগৌরী।।

এ ধরনের উদাহরণ কবির কাব্য থেকে প্রচুর দেয়া যাবে, যা কবির কাব্যসৌন্দর্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। কাহিনী অংশে 'উত্তম কাব্য সৌন্দর্যের ভাণ্ডার স্বরূপ' ময়নার বারমাসী অংশটি। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল যথার্থ বলেছেন, "দৌলতের কাব্য সরস কবিত্বে পূর্ণ। স্থানে স্থানে বর্ণনা যেমন কবিত্বময় তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তাহার বর্ণিত 'বারমাস্যা' অনুরূপ প্রচলিত সাধারণ বর্ণনাগুলির মত প্রাণহীন বা গদ্যময় নহে। চিরাচরিত রীতিতে শুধু নায়িকার ব্যক্তিগত দুঃখের কথাই তাঁহার বারমাস্যায় প্রকাশিত হয় নাই ; বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নায়িকার বেদনাতুর চিত্তের যোগাযোগ সম্পন্ন হইয়া সুললিত সঙ্গীতে নিখিল মানবের অন্তর্নিহিত বেদনার আভাসও ইহার মধ্যে স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"[১৭] ময়নার ব্যক্তি শোকোচ্ছ্বাস বিশ্ববিরহীর নির্বিশেষ বেদনার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ 'ময়নার বারমাসী' সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এরকম : "আমাদের অভিমত, কাজী দৌলতের এ অংশ উত্তম কাব্য-সৌন্দর্যের ভাণ্ডার স্বরূপ।"[১৮] 'ময়নার বারমাসী'তে ব্রজবুলি ও বাংলায় রচিত যে গীতগুলো আছে তা বাংলার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবজাত। এখানে মালিনী-ময়নার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সঙ্গীতের আবেদন ধরা পড়েছে, মধ্যানুপ্রাস ও অন্ত্যানুপ্রাসে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে ; ধূয়ায় ধ্বনিসৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে চিত্রসৌন্দর্য। কবি লিখেছেন :

আঁএ ধাই কুজনি কি মোকে শুনাওসি
বেদ উক্তি নহে পাটং।

---

১৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

১৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৮

লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়ে,

যে বিধি লিখিছে ললাটং।।

বিদ্যাপতির আদর্শে রচিত আর একটি পদে ধ্বনি মাধুর্য ফুটে উঠেছে।

শ্রাবণে সুন্দর ধাতু লহরী উঘার।

হরি বিনে কৈসনে পাইব আমি পার।।

আরও একটি পদ—

মালিনি কি কইব বেদনা ওর।

লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।

এটি গানের ধূয়া। এর চিত্র-সৌন্দর্য অপূর্ব। বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর" পদটির প্রতিধ্বনি এটি। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর পদমাধুর্য কাজী দৌলত আস্বাদন করেছিলেন। [১৯] এ ধরনের একটি পদ :

ভাদ্র মাসে চন্দ্রমুখি সুচরিতা কামিনী

(একাকি) বসতি তিমিরে অতি ঘোরং।

অধর মধুরৌ তামুল বিনা ধূসরৌ

নিচল চকোর আঁখি ঝোরং।।

জয়দেব-প্রভাবিত আর একটি পদের[২০] ছন্দোমাধুর্য ও প্রসাদগুণ ধরা পড়েছে দৌলতের এ পদটিতে—

আইল সুরুচি মধুমাস মধুঋতু

চৌদিকে কুসুম বিকাশ।

মলয়া কোমল মল্লি পরিমল

প্রসবিত কুঞ্জ সহাস।।

---

১৯. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্-এর বিখ্যাত একটি পদ—
'রতিসুখ সারে গতমাভিসারে মদন মনোহর বেশম্।

২০. জয়দেবের এ পদটি—
'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।।

নব চূত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল
কুঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কল কল কূজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে।।

এ ছাড়াও কাজী দৌলত তাঁর কাব্যে রূপক, উপমা উৎপ্রেক্ষা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবি যেমন—কালিদাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখের ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত কবির কাব্যে ব্যবহৃত সুপ্রাচীন 'বিদ্যাসুন্দরে'র প্রণয়-গাথার কথাও উল্লেখ করা যায়। এ কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রসঙ্গ এসেছে মোট তিবার—

১. চন্দ্রানী তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যাসঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।।
২. চন্দ্রানীর রূপ ভাবি লোরক ফাঁপর।
বিদ্যারসে মগ্ন যেন বৈদেশী সুন্দর।।
৩. বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।
দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।

বিদ্যা জ্ঞান ও সুন্দর রূপের প্রতীক হিসেবে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীতে বিদেশী অর্থাৎ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কাহিনীতে নায়কেরা নায়িকাদের পটে লেখা মূর্তি দেখে মূর্ছিত হন, পাগল হয়ে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন ঘোড়া সমারূঢ় হয়ে, বিদ্যাসুন্দরের সিঁদকাঁটা বিলাসের অভিনয় ও কূটনী সংযোগে গৃহস্থের বাড়ির কন্যাকে বশীকরণ ইত্যাদি ঘটনা ফারসি সাহিত্যের প্রভাবসূচক বলে মনে হয়। 'সতীময়না' কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ উল্লেখে মনে হয় গল্পের প্রথমভাগে লোর-চন্দ্রানীর প্রণয়ে ফারসি কেচ্ছার ছাপ পড়েছে। এবং ফারসি কেচ্ছার ভিত্তিতে রয়েছে আরব্য রজনীর প্রভাব।

'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের ছন্দ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও কবি ঐতিহ্য অনুসারি। এ কাব্যে যদিও গতানুগতিক পয়ার, ত্রিপদী ধারার অনুবর্তন লক্ষণীয়, তবুও স্বীকার করতে হবে যে, কবি এ কাব্যের ছন্দ পরিকল্পনায় বৈষ্ণব পদরীতির ছন্দকল্পকে আদর্শ করেছিলেন একদিকে, আবার অন্যদিকে মঙ্গলকাব্য পয়ারের

গড়ন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের অনুরূপ ত্রিপদী রীতিও কাজী দৌলত অনুসরণ করেছিলেন। এ ধরনের একটি পদ :

আইল সুরুচি মধুমাস মধুঋতু
চৌদিকে কুসুম বিকাশ।
মলয়া কোমল মল্লিপরিমল
প্রসবিত কুঞ্জ সুহাস।।

হিন্দি-কবি মিঁয়া সাধনের 'মৈনাসত' কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে কাজী দৌলত ছন্দের ক্ষেত্রেও সাধনের অনুসরণ করেন। দৌলতের কাব্যপ্রসাধনকলায় সাধনের কাব্যের কিছু অনুকৃতি লক্ষ্য করা গেলেও দৌলতের মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। 'মৈনাসত' কাব্যের ছন্দ ছিল চৌপদী ও দোহা। কাব্যের প্রারম্ভ ভাগে দৌলত তা উল্লেখ করেছেন।

ঠৈটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।
দেশীভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় আনন্দে।।
তবে কাজি দৌলত বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।।

'পাঞ্চালীর ছন্দ' সংস্কৃত 'পাঞ্চালিকা'র অনুবৃতি। এই পাঞ্চালিকা মূলত দোহা। যেমন আমাদের পাঁচালিগুলো সুরপ্রধান, তেমনি পাঞ্চালিকাও সুরপ্রধান, গেয় কাব্য। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে এই সুরপ্রধান ছন্দের পয়ার অনুবর্তন করেছেন কবিরা। দৌলত কাজী মধ্যযুগের গীতালি কাব্যধারার রীতি লঙ্ঘন করতে পারেন নি। তিনিও হিন্দি সাহিত্য ঐতিহ্যকে বাঙালির রসবোধে সিক্ত করে অপূর্ব এক কাব্য নির্মাণ করেছেন।[২১]

ত্রিপদী ছাড়াও দৌলত কাজী পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পয়ারের একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবহারযোগ্য রীতি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ছন্দোরীতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এবং

২১. মযহারুল ইসলাম ও দুলাল চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬

দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধগুলো সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে এ কাব্য বাংলা সাহিত্যের আসরে দেখা দিয়েছিল। আর এসব পঙ্‌ক্তিবন্ধের মধ্যে 'পয়ার' নামে খ্যাত আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী বন্ধটিও এই সময়েই বাংলা কাব্যের প্রধানতম বাহন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। দৌলত কাজী তাঁর কাব্যে চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট (৮ + ৬ = ১৪) মাত্রার পয়ার রীতি ব্যবহার করেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ঃ

১. পশ্চিমেত এক রাজ্য / আছয় গোহারি । ৮+৬=১৪
তাহাতে মোহরা না মে / রাজা অধিকারী ॥ ৮+৬=১৪

২. এই মাস গেল সতী / লোর গুণি গুণি । ৮+৬=১৪
আইল মাধবী মাস ঋতু রাজ পুনি ॥ ৮+৬=১৪

কাজী দৌলতের ব্যবহৃত পয়ার অক্ষরবৃত্ত শ্রেণীর। এ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরকে একমাত্রা হিসেবে ধরা হয়। শুধুমাত্র হলন্তযুক্ত শব্দকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়ে থাকে। দৌলতের ব্যবহৃত পয়ারের লয় ধীর ; ধ্বনি প্রধান, শ্বাসাঘাত প্রধান না হয়ে তানপ্রধান রূপ গ্রহণ করেছে। ছয় মাত্রার পর্বের পয়ার ছন্দও কবি ব্যবহার করেছেন।

কাহারে কহিব / মনের মরম
কেবা যাবে পর / তীত
হিরার মাঝারে / মরম - বেদনা
সদাই চমকে / চিত ॥

ত্রিপদীর উদাহরণ ঃ

কহে কাজী দৌলৎ / সাফল্য সে সম্পদ
যার নামরহয় / সংসারে ।
জীবন যৌবন ধন / না রহিব সর্বক্ষণ
অমর হইব / উপকারে ॥

ছন্দ-অলঙ্কারের মতো ভাষা-শব্দ ও ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তিও ছিল কাজী দৌলতের। এক্ষেত্রে কবির সচেতনতা ও মার্জিত-সংযমবোধের পরিচয় রয়েছে। কবির জন্মভূমি চট্টগ্রাম ; এখানে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কথ্যভাষার রূপ তাঁর কাব্যে সহজলভ্য। এ কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা যদিও সাধু বাংলা ; তবুও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের ফলে তা শ্রুতিমধুর হয়েছে, ভাষার গাঁথুনি হয়েছে দৃঢ়। যেমন : লোর, তুরু, বোল, ভোল, গোপ, তুল, কুল ইত্যাদি। অপিনিহিতি

পৈয়ারন্ত < পরাণ ; জৈক্ষ > যক্ষ, রৈক্ষক > রক্ষক ইত্যাদি। বাক্যরীতি— 'কে গেলা শশিকলা' বা 'কনে বা বুঝিতে পারে', 'কোন বতে আছিল বিরহ মনভঙ্গ', 'কুলের চন্দ্রিমা মোর কুমারী চন্দ্রানী। সেই ভাল হৈল হৈছে তোমার রমণী।।' 'অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে।' ইত্যাদি বাক্যগীতি পূর্ববংলার বাক্যরীতির অনুরূপ।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, কাজী দৌলত 'সতীময়না লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের নির্মাণ শৈলীতে পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্যে তিনি সুদক্ষ শিল্পী। দৌলত কাজী বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি এবং বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি বলা যেতে পারে। তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগ হিন্দি কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে বলে হয়তো এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিকতা দাবি করতে পারেন না, কিন্তু প্রচলিত লোককাহিনীকে যে তিনি একটি রমণীয় রূপকথাধর্মী রোমান্টিক আখ্যায়িকায় পরিণত করেছেন, তা স্বীকার করতে হবে। মাত্র একখানি অসমাপ্ত কাব্য রচনা করে কাজী দৌলত বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। আলাওলের মতো বিখ্যাত কবিও অসম্পূর্ণ কাব্যকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে 'শেষরক্ষা করতে পারেন নি'। সেদিক থেকে কাজী দৌলত তাঁর এ কাব্যে বিচক্ষণতার অজস্র নিদর্শন রেখেছেন। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ত্য-জীবনরসের কবি। উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি ও বিচক্ষণতার বিচারে কাজী দৌলতের 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী' কাব্যকে মধ্যযুগের একখানি মূল্যবান মর্ত্য-জীবনের সেকুলার কাব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।